কথা বনাম কাজ

(বর্ত্তমান দশায় আমাদের বক্তব্য ও কর্ত্তব্য)

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী রচিত

ও

১৭ই ভাদ্র, রামমোহন লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লির হলে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ (লেখক রচিত নূতন গান ও কবিতা সম্বলিত)

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু
প্রকাশক

মূল্য দুই আনা মাত্র

উৎসর্গপত্র

স্বদেশবৎসল, নিপুণ কর্ম্মী

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসুকে

এই পুস্তিকা

সাদরে

উপহার

প্রদত্ত

হইল

মিশ্র-ইমন—তেওরা।

তুমিই পিতা, তুমিই মাতা,
তুমিই মোদের পাতা!
তুমিই মোক্ষ, তুমিই লক্ষ্য,
তুমিই মোদের ত্রাতা!

চরণচুম্বিত বিশাল সিন্ধু
ও শুধু তোমার মহিমাবিন্দু!
তোমার তপন তোমার ইন্দু
করুণা-কিরণ-দাতা!

মেলি শুভ্র জটাজুট দাঁড়ায়ে স্থির হিমকূট,
যেন তোমার কীর্ত্তিমুকুট ভাতে জগত-ঊর্দ্ধে!

অয়ি পুণ্য-স্বর্ণভূমি, ধন্য, ধন্য, ধন্য তুমি,
তোমার শিষ্য নিখিলবিশ্ব,
নিঃস্ব কি তুমি, মাতা!

রামপ্রসাদী সুর।

(জেনারেল অ্যাসেম্ব্লির সভায় গীত)

তুই মা মোদের জগত-আলো !

সুখে দুখে হাসিমুখে

আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো !

মা ব'লে মা ডাক্‌লে তোরে,

সারাটি প্রাণ ওঠে ভ'রে,

বেসেছি মা তোরেই ভালো,

তোরেই যেন বাসি ভালো !

ওই কোলে মা পাই যদি ঠাঁই,

জনম জনম কিছুই না চাই,

থাক্ না ওদের গৌরবরণ,

হলেমই বা আম্‌রা কালো !

পরের পোষাক খুলে' ফেলে'

ফির্‌লাম ঘরে ঘরের ছেলে,

আঁখির নীরে মোদের শিরে

আশীষধারা আজি ঢালো !

কথা বনাম কাজ।

কথা আর কাজ, সরল ভাষার এই দুটী অতি সহজ শব্দ ভিক্ষা ও আত্ম-চেষ্টার মুখোস্ পরিয়া নূতন জাঁকাল-উপাধিগ্রস্থ দাম্ভিক ধনীনন্দনের মত সহসা পুরাতন ঐক্যবন্ধনের মধ্যে অনাবশ্যক আঘাত দিয়া গিয়াছে। সুখের বিষয়, সে আঘাতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই, বরং বন্ধনের দৃঢ়তাই পরীক্ষিত হইয়াছে।

'আত্মচেষ্টা' এই সংস্কৃত খণ্ডকে বিশ্লেষণ দ্বারা সংস্কৃত ও সঙ্কীর্ণ করিলে 'কাজ' ইতি ভাষা হইয়া দাঁড়ায়। কাজ যে বাজে কিছু নহে, নিতান্ত খাঁটী, তাহা যুগযুগান্তরের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে খেলাঘর হইতে হাতে-কলমে শিখাইয়া আসিতেছে, তাই রবীন্দ্রবাবু বিপক্ষের ইঙ্গিত লক্ষ্য বা কটাক্ষ আশঙ্কা করিয়া সবিনয়ে একাধিকবার স্বীকার করিয়াছেন,—আমি নূতন কিছু প্রচার করি নাই। ইহা শিষ্টতার অতিবাদ নহে; বর্ণে বর্ণে সত্য উক্তি।

কথায় চিড়া ভিজে না, তাহার জন্য তরল পদার্থ আহরণ করিতে হয়। এই উপদেশ যিনি দেন, তিনি একটী চিরন্তন বাণীর প্রতিধ্বনি করেন। রবীন্দ্রবাবু এই দুঃসময়ে অথবা সুসময়ে সেই উপকারটী বাছিয়া লইয়া অগণ্য ধন্যবাদ লাভ করিয়াছেন; আমরা সেই সব অভিনন্দনের অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে ভারাক্রান্ত করিব না।

কথা না কাজ? কঃ পন্থা? এই সাদা প্রশ্নটীকে সমস্যার মত জটিল ও আবিল করিয়া লইয়া রবীন্দ্রবাবু এবং তাঁহার প্রতিপক্ষের মধ্যে বেশ লেখালেখি, এমন কি, শেষ রোখারুখিও হইয়া গিয়াছে। অনেক অবান্তর

কথার মধ্য দিয়া ছিদ্রান্বেষী দুই একটা সাহিত্যিক শর যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াই বিদ্ধ হইয়াছে ও বিদ্ধ করিয়াছে। অসিহীন মসিসমরের এটা দস্তুর। সম্পূর্ণরূপে নিরীহ ও নিরাপদ হইলেও, ইহাকে ন্যায়যুদ্ধ বলিতে পারি না। সে সব অতীত আলোচনার সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। উভয় পক্ষই আহত হইয়া একান্তে আত্মসংবরণ ও আত্মসংশোধন করিয়া লইয়াছেন। এখন এমন একটী সন্ধিস্থলে দুইদল আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যেখান হইতে মিলনমণ্ডপের স্নিগ্ধ ছায়া অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

তর্ক উঠিয়াছিল,—যে কথা বা ব্যক্ত-মনোব্যথার মূল্য এক কাণাকড়িও নহে, যে অক্ষম-চীৎকার বহুবর্ষ ধরিয়া আমাদের ভাগ্যবিধাতাগণের অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, সেই নিদারুণ বিড়ম্বনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা উচিত কি না? রবীন্দ্রবাবু তীব্র ভাষায় এই কাঁদুনিকে ধিক্কার দিয়াছেন। রোষে ক্ষোভে গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছেন,—আর না, যথেষ্ট কাঁদিয়াছ বাঙ্গালী, এখন কাজ কর; উহাই সফলতার সদুপায়। এ উত্তেজনা শুনিতে এতই সুন্দর এবং নিপুণ কণ্ঠের উন্মাদনায় এতই মর্ম্মস্পর্শী; যে উহা নিঃসংশয়ে মানিয়া লইবার প্রলোভন এড়ান সহজ হইয়া উঠে না। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে দ্বিধা আসে। কাজ ত করিবই; কথা কেন ছাড়িব? অন্যায়ের প্রতিবাদ বন্ধ করিব কেন? অবিচারের সমালোচনা কেন ত্যাগ করিব? রবীন্দ্র বাবু বলিতেছেন,—উহার নামান্তর ভিক্ষা। ‘ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ’। তা হৌক্; তাই বলিয়া প্রবলের কাছে আমাদের কণ্ঠরোধ হইয়া যাইবে! নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যের মর্ম্মস্থলে কোটিকণ্ঠের ক্ষুব্ধ ভাষা একটা ক্ষুদ্র আঘাতও করিয়া আসিবে না! তবে যখন সরকার আইন করিয়া কণ্ঠ-রোধের ব্যবস্থা করিলেন, তখন সেই অধিকারটীকে অব্যাহত রাখিতে যে লড়াই করিয়াছিলাম, তা কি এইরূপে হারাইতে? বহুবার কথার বাজে-খরচ হইয়া গিয়াছে, জানি; মাঝে মাঝে কাজে আসে নাই, এ কথা মানি

না। ভাষাবিভাগের বিরুদ্ধে তুমুল মুখর-আন্দোলন কি পণ্ড হইয়াছে? এক্ষেত্রে একেবারে নিঃশব্দ হইয়া গিয়া হঠাৎ একটা কো-অপারেটিভ স্বদেশী খুলিয়া ফেলিলে খাসা হইত বটে, কিন্তু ভাষাকে অক্ষুণ্ণ রাখা যাইত কি ষ্টোর:না সন্দেহ।

রবীন্দ্রবাবুর নিজের সৃষ্ট ভিক্ষা কথাটা তাঁহাকে নিরর্থক গোলে ফেলিয়াছে। ভিক্ষার মধ্যে যে একটা দৈন্য নিহিত আছে তাহা রবীন্দ্র-বাবুকে পীড়ন করিতেছে। করিবারই কথা। কিন্তু উপায় যে নাই! যে স্পর্দ্ধায় জাপান রুষের সহিত দাবীদাওয়ার ভাষা চালনা করে, ঠিক সেই ওজনের দাবীই আমাদের মুখে ভিন্ন ভঙ্গীতে বাহির হইয়া যায়! ইহা পদলেহন নহে, ললাটলেখন। তবু দাবী, দাবীই; ভিক্ষা নহে। সেই স্বাভাবিক স্বত্ব, সেই ন্যায্য অধিকার ত্যাগ করিলেই যে আমরা মানুষ হইব, তাহার কোন অকাট্য প্রমাণ নাই; বরং বিরুদ্ধে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

একজন মারিবার মতলব আঁটিয়াছে, তখন তাহাকে বুঝাইয়া প্রতি-নিবৃত্ত করিতে যাওয়া দুর্ব্বলের কাপুরুষতা নহে; মনুষ্যত্বের ধর্ম্ম। আঘাত যখন উদ্যত, তখনই প্রত্যাঘাত অনিবার্য্য। তার আগে নয়। সেই ধৈর্য্য, সেই সংহত-বীর্য্য যখন অন্যায়ের দ্বার হইতে লাঞ্ছিত হইয়া আসে, তখনই তাহা দেবতা ও মানুষের নিকট প্রকৃত বল লাভ করিয়া সফল হয়। তার আগে নয়।

বর্ত্তমানে যে অগ্নি জ্বলিয়াছে, যদি উহা দেশব্যাপী হুতাশের নিরবচ্ছিন্ন ফুৎকার ও ব্যর্থ-ক্রন্দনের গুপ্ত-ইন্ধন না পাইত, যদি উহা রাজদ্বারে অকারণে অবমানিত হইয়া না ফিরিত, তবে কি এমন প্রবল হইয়া উঠিত? সেই হোমানলে বিদেশী বসন-ভূষণের যে সৎকার চলিতেছে, সমস্ত বাঙ্গলার উপেক্ষিত তপ্ত-অশ্রুধারা নিয়ত তাহাতে ঘৃতাহুতি যোগাইতেছে!

আমরা যদি গোড়াতেই ইংরাজকে অবিশ্বাস করিয়া বসিতাম, ইংরাজের শাসনতন্ত্রকে পীড়নের যন্ত্রজ্ঞানে ঘৃণা করিতে শিখিতাম, তবে আমাদের সেই চেষ্টাকৃত অপরিণত বিতৃষ্ণার মধ্যে কাপট্য থাকিয়া যাইত; কিন্তু ধৈর্য্যশীল অভিজ্ঞতা আমাদিগকে এমন সুকঠিন বর্ম্মে আবৃত করিয়া দিয়াছে, যেখান হইতে রাজভক্তি বারবার বাধা পাইয়া ফিরিতেছে।

অপরপক্ষ বলেন,—রবীন্দ্রবাবুর দ্বিধা গঠনোন্মুখ সমাজে 'ভাঙ্গন' আনিয়াছে।—এ অভিযোগ-অনুযোগের কোন হেতু নাই। রবীন্দ্রবাবু এমন কোন অদ্ভুত কথা বলেন নাই, কি অপূর্ব্ব পন্থা আবিষ্কার করেন নাই, যাহা প্রবীণ সমাজকে নবীনভাবে ভাঙ্গিতে গড়িতে পারে। রবীন্দ্রবাবুর তরফ হইতে হয় ত কথা উঠিবে,—তা হ'লে ত চুকিয়াই গেল! —তবে বিরোধ ছিল কোথায়? মতভেদ দাঁড়াইয়াছিল কিসে? আসল কথা, দ্রুতসংশোধিত রবীন্দ্রনাথ সদলবলে এখন যে জায়গাটীতে আসিয়া তাঁবু গাড়িয়াছেন, সেখান হইতে বিপক্ষের সীমা-ব্যবধান হ্রস্ব হইয়া আসিয়াছে। ছোট হোক্, বড় হোক্, ব্যবধান ত বটে! উহার ঔচিত্য-অনুচিত্য আবশ্যকতা-অনাবশ্যকতার আলোচনা বাহুল্য নহে। আমরা রবীন্দ্রবাবুর বিরাগ বা বিরোধকে আকস্মিক কি অনাহূত বলিতে পারি না। অর্দ্ধশতাব্দীর নৈরাশ্য দ্বারা উহা প্রবুদ্ধ ও প্রবৃদ্ধ। ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না, স্বাধীন দেশের গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলনপ্রথার অক্ষম অনুকরণের দিকে এই পতিত জাতির একটা মারাত্মক ঝোঁক দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ডবল-প্রোমোশনপ্রাপ্ত ছাত্রের ন্যায় আমরা গোড়ায় কাঁচা থাকিয়া খুব চট্‌পট্ অগ্রসর হইতেছিলাম। ইহা নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু যে জাতি কেবল পায়ে ভর করা অভ্যাস করিতেছে, তাহার পক্ষে স্খলন-পতন আকস্মিক কি অভাবনীয় নহে। ত্রুটি অনেককাল ধরা পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের উপায়ও উদ্ভাবিত হইতেছে। এই যে সুবাতাস বহিতেছে,

কোন ব্যক্তিবিশেষের ফুৎকারে ইহার উৎপত্তি নহে। সমগ্র দেশের বহুবর্ষ-সঞ্জাত নিস্ফলতার দীর্ঘশ্বাসে ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জাতীয় মহা-সমিতি যেদিন রুদ্ধ-শিল্পাগারের চাবি খুলিলেন, সেদিন আমাদের নাড়িতে কি এক অভিনব স্পন্দনই অনুভূত হইল!

রবীন্দ্রবাবু রাজদ্বারের দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন,—ঐ পাষাণকপাট কিছুতেই মুক্ত হইবার নহে!—কসাইখানা কখনও সরাইখানা হইয়া উঠিতে পারে না, এ কথা ঠিক; কিন্তু বাণী ত পাষাণী নন; তিনি নবনীকোমলাও নহেন। কাপুরুষের মুখে যে বাণী আবেদন-নিবেদনের মত শুনায়, বীরের কণ্ঠে তাহাই প্রতিকার বা প্রতিবাদের ভেরীনিনাদ ঘোষণা করে। নিভন্ত দীপশলাকার অগ্নি জ্বলন্ত মশালে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে! আমরা যদি কথার মত কথা শুনাইতে না পারি, তবে সে অক্ষমতার জন্য ধিক্কার দিলে তাহা মূকদিগকেই অধিক স্পর্শ করিবে! যেদিন লাটমজলিসে মহামতি গোখ্‌লে বাজেটের সমালোচনা করিয়াছিলেন, মারাঠী ব্রাহ্মণের মুখে সেদিনকার আবেদন-নিবেদন নিশ্চয়ই রাজপুরুষদের কর্ণে সুধাবর্ষণ করে নাই!

ক্ষমতামদান্ধ দম্ভস্ফীত কার্জ্জনী তর্জ্জন যে উৎসাহে পবিত্র বিদ্যামন্দিরকে কলঙ্কিত করিতে সাহসী হইয়াছিল, যদি সমগ্র দেশের গর্জ্জন দ্বারা অবিলম্বে শাসিত না হইত, তবে কি সেই ধৃষ্ট অনধিকারচর্চ্চা আমাদিগকে দমিত ও নমিত জ্ঞানে মুখে মুখে পুনরাবৃত্তির জন্য মাতিয়া উঠিবার প্রশ্রয় পাইত না?

আমাদের পাঁচ বছরের সেই ভাড়াটে লাট যে মুখে আরও দুই বছরের ম্যাদ বাড়াইতে ছুটিয়াছিলেন, এবারকার যাত্রায় যদি সে মুখ চুন হইয়া যায়, তবে তাহা দেশব্যাপী চীৎকারে বা ধিক্কারে। জানি, লাট বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবেন না, কিন্তু বড় তরিয়াও যাইবেন না! অন্তত তাঁহার পরবর্ত্তীকে একটু সাম্‌লাইয়া পা ফেলিতে হইবে। যাহারা

বলেন, আমরা এখন পীড়নই চাই, তাঁহারা ভারি ভুল করেন। আমাদের মত অধীনের উপর জুলুমের মাত্রা যে বহুদুর চড়িতে পারে, ঝোঁকের মাথায় তা ভাবিয়া দেখেন না! সে চাপে আমাদের কচি জাতীয়তা নিষ্পেষিত হইয়া যাইতে পারে! আমরা তা হইতে দিতে পারি না। সেই আত্মরক্ষার জন্য দ্বন্দ্ব চাই। যখন কেহ উৎপাত করিবার ছিল না, তখন শান্তিমন্ত্র শুনাইত ভালো! পরের পয়জার খাওয়াই যদি নিজের চৈতন্য লাভের একমাত্র উপায় স্থির হইয়া থাকে, তবে ধিক্ সেই স্বাদেশিকতাকে!

আন্দোলনশ্রান্ত বাঙ্গালী বহুবার ভগ্নমনোরথে ঘরে ফিরিয়া ঘুমাইয়াছে। তাই নৈরাশ্যপীড়িত রবীন্দ্রনাথ পরম বন্ধুর মত এবার আগেই সতর্ক করিতেছেন,—এখন আমাদের ঘরে ফিরিয়া কাজ করিবার সময় আসিয়াছে।—তথাস্তু। কিন্তু বাহিরের সমস্ত আপদকে, রাজসভার সমস্ত ষড়যন্ত্রকে অবাধে পুষ্ট হইতে দিলে, ঘরের আয়োজন কোন্ অশরীরী স্বপ্নের সেবায় লাগিবে? গোরার দরবারে যখন কালার কোন বিশেষ অধিকার হরণের চক্রান্তচক্র চলিবে, আর তাহাতে সদুদ্দেশ্য আরোপিত করিয়া ফিরিঙ্গীর কাগজগুলা আমাদিগকে কৃতজ্ঞ ও রাজভক্তিমান্ হইবার জন্য ক্ষতে লবণ নিষেক করিবে, সেই স্পর্দ্ধা, সেই নিহিত ব্যঙ্গ স্বচ্ছন্দে গলাধঃকরণ করিয়া যদি আমরা সুবোধের মত অবাক্-স্থৈর্য্যে তাড়াতাড়ি স্বদেশী ব্যায়ামাগারের ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাহার প্রতিশোধ লই, তাহাতে আওয়াজ যথেষ্ট হইবে, এবং তাহা ফাঁকা নাও হইতে পারে; কিন্তু ঠিক লক্ষ্যটী ভেদ হইবে না। বাহিরে গভীর গর্জ্জন করিলেই যে ঘরের নীরব অর্জ্জনে বাধা হইবে, এরূপ আশঙ্কার কোন সঙ্গত কারণ নাই। দুই-ই চালাইতে হইবে। একের দ্বারা অন্যের সফলতার সদুপায় হইবে। ছায়ালোকের ন্যায় একের অভাবে অপরের অস্তিত্ব হানির সম্ভাবনা আছে।

রবীন্দ্রবাবুর আর এক প্রস্তাব, দলপতি বা নায়ক নির্ব্বাচন। সমস্ত বঙ্গের একজন স্থায়ী অধিনায়ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, যাইবেও না। কেহ কেহ বলেন,—তিনি আসিবেন। আসুন, আপত্তি নাই; কিন্তু তাহার আগে আমরা শত শত সুসন্তানকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে নেতার পদে বরণ করিয়া লইব। আসল কথা, নবসভ্যতাদৃপ্ত নূতন আলোকপ্রাপ্ত সোণার বাঙ্গলা কি কখনও একজনের হাতের ক্রীড়াপুত্তলী হইতে পারে? একটী সমবেত নেতৃশক্তির চালনায় উহার শক্তির বিকাশ হইবে। সেই সমবেত নেতৃশক্তিকে একটী সার্থক আকার দিতে হইবে, উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সচল ও সবল করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্য চাই, কতকগুলি বাছা বাছা তাজা মন, যাহারা দেশকে কবির মত ভালবাসিবে; কর্ম্মীর মত সেবা করিবে। তাহাদিগকে ত্যাগব্রতে দীক্ষা লইতে হইবে। এই ত্যাগের অভাবেই আমরা মৃত, নতুবা ভাগে আমাদের কি করিত? হাজার কর, দেশের জন্য দশের জন্য স্বার্থত্যাগের আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানায় বা স্বদেশীসভার কলে গড়া যাইবে না। ইহার জন্য চাই, গৃহ-শিক্ষার সংস্কার; চাই মাতৃত্বের বিকাশ। তবেই একটী প্রকৃতসন্তানের দল গঠিত হইবে, যাঁহারা দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনিতে সক্ষম হইবেন,—'বন্দে মাতরম্'! মাতা তখনই যথার্থরূপে বন্দিত হইবেন।

এই যে স্বদেশী অভিযান, ইহা কেন প্রদেশে প্রদেশে, পল্লীতে পল্লীতে সবেগে শৃঙ্খলা রাখিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে না? ইহার মূলে জাতীয় চরিত্রবলের অভাব। খেয়ালী বাঙ্গালীর উদ্যমে অনিয়ন্ত্রিত কার্য্যপ্রণালীর নিদর্শন সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সেই পদ্ধতির শোধন করিয়া লইতে হইবে। বিলাতী বসন-ভূষণ স্পর্শ করিব না, কিন্তু বিলাতের নিকটেও আমরা শৃঙ্খলা শিখিব, স্বদেশহিতৈষা শিখিব, স্বজাতিবাৎসল্য শিক্ষা করিব এবং আত্মত্যাগের দীক্ষা লইব। এ সব বিদেশজাত আমদানীকে আদর্শ

করিলে, বিলাতি সংস্পর্শের দোষ ঘটিবে না। জাতীয়তার অনুশীলন, লব্ধ সিদ্ধিকে রক্ষা ও অপ্রাপ্ত বৃদ্ধিকে লাভ করিবার জন্য স্বদেশী সভা কি জাতীয় সন্মিলনীই বল, অথবা প্রাচীন বঙ্গের অনুকরণে পল্লীপঞ্চায়েৎ বা গ্রাম্য-বৈঠকই বল, একটী সমবেত কার্য্যকরী সাধনাকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। উহার নামকরণ ধরণ-ধারণ দেশীয় হৌক্, কিন্তু বিদেশীয় নৈপুণ্য দ্বারা উহাকে পূর্ণতা অর্পণ করিতে হইবে। এই নব পঞ্চায়েৎকে আদালত করিয়া তুলিলে, ভারাক্রান্তই করা হইবে! গুরুদোষে দণ্ডদান, রাজশক্তির অঙ্গ; ন্যায়বিদ্রোহীকে মিমাংসায় বাধ্য করা রাজশক্তিসাপেক্ষ। মামলা একটা প্রকাণ্ড জুয়াখেলা! ফাঁকি দিয়া বা ফাঁকিতে পড়িয়া রাতারাতি লাল হইবার নেশায় চিরদিন পূর্ব্ব ও পশ্চিম মাতোয়ারা! লোভ বা বিদ্বেষ যতদিন আছে, এই স্বার্থনাশা স্বার্থপরতা ততদিন চলিবে। ব্যক্তিগত কূট ফন্দি ও খল অভিসন্ধির সূক্ষ্ম বাহির করিতে করিতে সভার সভাত্ব ঘুচিয়া যাইবে। সুবোধের জন্য সালিশ সর্ব্বত্র হইতেই সংগ্রহ হইতে পারে। আপোষ বা সালিশী সভাগৃহ অপেক্ষা চণ্ডীমণ্ডপেই সাজে ভাল। পল্লীমণ্ডলী যেরূপে গঠিত হইবে এখন তাহাই আলোচ্য। পনর কুড়িটী পল্লী মিলাইয়া একটী মণ্ডলী হইবে। জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় ত কথাই নাই, প্রত্যেক মণ্ডলীতে বা চক্রেই একটী সভা কি সম্মিলনী থাকিবে। তাহা হইলেই যাঁহারা বহুকাল হইতে বাঙ্গলাকে শাসন করিয়া আসিতেছেন, সেই মুকুটবিহীন জ্ঞানবৃদ্ধ কর্ম্মীগণের হস্তেই বাঙ্গলাকে অধিকতর প্রত্যাশায় সমর্পণ করা হইবে। নেতা বা সভাপতি আপনিই জুটিবে; সেজন্য আয়োজনের প্রয়োজন হইবে না। কোন সভায় মুসলমান কোন সম্মিলনীতে হিন্দু অধিনায়কের পদে বৃত হইবেন। এই সব শাখাসভা নাগরিক মূলসভার কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া কাজের কৈফিয়ৎ দিবে। এইরূপেই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদকে আমরা নিষ্ফল ও অগ্রাহ্য করিতে পারিব। নচেৎ লাটসভার সদস্যপদ,

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোসিপ্, মিউনিসিপ্যালিটীর মেম্বরী হঠাৎ-ঝোঁকে ছাড়িলে, একটা প্রগল্‌ভ উষ্মা দেখান হইবে, আর বিরূপসমালোচনাতপ্ত ইংরাজের সুনিদ্রারই ব্যবস্থা করা হইবে। আমাদের ভিতরের ষ্টিম্ শৃঙ্খলার এঞ্জিনে না পুরিলে, কেবল ফাঁকা ধোঁয়া আর বাষ্পের মত উবিয়া উড়িয়া যাইবে!—কবে আমাদের কারখানাঘরের পবিত্র ধূমে ও শত শত বিচিত্র কলের জয়কলরবে পরমুখাপেক্ষী বাঙ্গলা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

রবীন্দ্রবাবুর দল বলিবেন,—তা বেশ; কিন্তু আবার সভা? আবার সেই হাঁক-ডাক? সেই হাততোলা আর হাততালি? অ্যাজিটেসন্ আর রেজলিউসন্? নগরের দুষ্ট বায়ু সোণার পল্লীতে প্রবিষ্ট ও পরিব্যাপ্ত হইতে দিবার এ কি ধৃষ্ট আয়োজন! বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে কার্য্যটা হইবে কি?—এক কথায় ইহার স্পষ্ট উত্তর চলে না। স্বাধীন দেশের ন্যায় আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র নিষ্কণ্টক নহে। যাহাদের জাতিত্ব গঠিত হইয়া গিয়াছে, যাহাদের জমি তৈয়ার হইয়া তাহাতে ফসল ফলিতেছে, তাহাদের সহিত আমাদের যোগ কোথায়? আমাদের বর্ত্তমান দশা অনেকটা আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের মত, পরীক্ষার অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরীক্ষিত ব্যবস্থা দ্বারা সাফল্যের পথ প্রাপ্ত হয় নাই। তবু কাজের আলোচনায় লাভ আছে।

কাজ কি?—কথাও কাজ, কাজও কাজ। স্বাধীন দেশের পক্ষেও, অধীন দেশের পক্ষেও। কেবল পাত্রভেদে বক্তব্য ও কর্ত্তব্যের স্থান-কাল নির্দ্ধারণ-নির্ব্বাচনের সময় আমাদের আসিয়াছে। দেশে বিদেশে অনেক দামী ও নামী মস্তিষ্ক এই চিন্তায় ঘুরিতেছে। বার্ষিক কংগ্রেসী ব্যয় বাহুল্য হইলেও বর্ত্তমানে অত্যাজ্য।—এ সিদ্ধান্ত সেই চিন্তারই ফল। কাজের প্রকৃতি হইবে কি, পরিণতি দাঁড়াইবে কোথায়, প্রণালী-পদ্ধতি কেমন হইবে, এখন তাহাই বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে। সেই মনন ও বীক্ষণ কবিতার ন্যায় আভাসে না বুঝাইয়া কর্ম্মিষ্ঠতার স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে;

বাগাড়ম্বরকে বাগ্‌দত্ত করিবার পূর্ব্বে বচনে ও রচনে রূপকের ছটা ও উপমার [illegible] চোস্ত করিয়া আস্ত আসল বক্তব্যটী প্রাঞ্জল করিতে হইবে; পল্লবিত উচ্ছ্বাসে উপসংহার জমকাল না করিয়া সহজ মিমাংসায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে। [illegible] কথা বড় না কাজ বড়? করা ভালো কি কহা ভালো? ঘর আপন না পর আপন? ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পুন পুনঃ এই সব বাজে কথা ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া লতায় পাতায় বাড়াইয়া তুলিলেও কোনকালে কাজে আসিবে না।

[illegible] জনশিক্ষা, ধনবৃদ্ধির উপায়, কৃষির উন্নতি, শিল্পের সংস্কার এই কয়েকটা প্রধান অভাবের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ুক্। ইহা ছাড়া, প্রতিনিধিদের কর্ত্তব্যের নির্দেশ প্রতিদিনের বিচার দ্বারা হইবে। জন-শিক্ষার দিকেই আমাদের প্রথম নজর পড়া উচিত। স্থানে অস্থানে আমরা কংগ্রেস কনফারেন্সকে খোটা দিয়া বলি,—উহা ইংরাজীবাগীশের বক্তৃতার লীলাভূমি! লোকসাধারণ সে যজ্ঞে অনিমন্ত্রিত; উপবাসী! এদিকে জনমণ্ডলীর অক্ষমতা আমরা দেখিতে পাই না! হরকছমের বর্ব্বরের দল জড় করিয়া নকল-হাততোলা ও নকল-হাত-তালির অভিনয়ে বাহিরে প্রবোধ পাইলেও, অন্তরের সায় পাওয়া যায় না। মূলত ও স্থূলত রাজনৈতিক চর্চ্চায় প্রাণের সহিত যোগ দিতে পারে, এই ভাবে তাহাদিগকে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। তখন আপনা-আপনিই ইংরাজীনবিসের মুখ দিয়া দেশীয় ভাষার খৈ ফুটিবে। বৃহৎ জনতাকেও আর কর্ম্মমন্দিরের বাহিরে পড়িয়া ভিতরকার রহস্যভেদের জন্য হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিতে হইবে না। একটী রাজনৈতিক প্রচারকের দলকে এই দীক্ষাদানের ব্রত লইয়া পল্লীতে পল্লীতে ফিরিতে হইবে। এই শিক্ষায় পল্লী তাহার স্বাভাবিক পল্লীশ্রী হারাইবে না। কবির নিকট চিরকালই পল্লীস্বপ্নের মাধুরী অটুট থাকিবে। উহাকে কর্ম্মীর নিকট সার্থক হইতে

হইবে। কর্ম্মীর বন্দিতা হইলেই পল্লীলক্ষ্মী কবির নিন্দিতা হইবেন না! বিপুল জনসংঘাতকে সদা তরঙ্গিত রাখিতে হইবে! তাহা হইলেই আমাদের জাতীয় উদ্বোধনে সমগ্র দেশের সাড়া পাওয়া যাইবে। পল্লীমেলায় বা গ্রামের হাটবাজারে এলোমেলো জাতীয়তাচর্চ্চা খাঁটি স্বদেশী কল্পনা; কখনও বাস্তবের সেবায় লাগিবে না। রাজদণ্ড আমাদের হাতে না-ই থাক্, যখন মাথায় পড়িতেছে, তখন উহার নাড়িনক্ষত্র ছোট বড় মাঝারী সকলকেই তলাইয়া চিনিতে হইবে। আমরা যে জাতীয় জীবনের নূতন আস্বাদ পাইয়া উহার নেশায় পাগল হইয়া উঠিয়াছি, উহার চিহ্ন পর্য্যন্তও আমাদের বহুরত্নপরিপূরিত ভাণ্ডারে ছিল না। বিদেশের আমদানি হইলেও সেই ধার-করা ধন দিয়া অধমর্ণ উত্তমর্ণের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে, ও চাই কি, ঋণশোধেও সমর্থ হইবে।

জবরদস্তের নিকট ঘা খাইলে আমরা সভা করিয়া গা'ল পাড়ি, আর খবরের কাগজে ঝাল ঝাড়ি!—এই প্রকারের একটা ধুয়া বহুদিন হইতে বাজারে চলিত। রেজলিউসন্ আর আর্টিকেলের নামে গোরারাই ক্ষাপ্পা; দেখাদেখি আমরা কালারাও ক্ষেপিতে সুরু করিয়াছি! বকাবকি আর লেখালেখি দোষেগুণে বৃদ্ধি পাইয়া যদি সমস্ত দেশকে জাগরণের জন্য প্রস্তুত না করিত, তবে দশা কি হইত? সংবাদপত্র আর সভাসমিতি লোকবল সংগঠনে গুরুর কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, বরাবর করিবেনও। বৃথা তাচ্ছিল্যে দেশের মধ্যে একটা দ্বিধা দাঁড়াইতেছে, এ দুঃসময়ে উহা কুশাঙ্কুরের মত বিঁধিয়া থাকিলেও দোষ; কাঁটাটী সমূলে উৎপাটিত হওয়া চাই।

অন্তঃপুরিকাগণকে আমরা সযত্নে বাহিরের কর্ম্ম-কোলাহল হইতে দূরে রাখিয়াছি; পাছে তাঁহাদের স্বভাবসুলভ কোমলতাটী সেই আহবে অব্যাহত না থাকে! এখন ঠেকিয়া বুঝিতেছি, দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনে

তাঁহাদেরও অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। আর তাঁহারা সে ক্ষেত্রে শুধু কলের পুতুলের মত চলিলেও শেষরক্ষা হয় না; তাঁহাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত সহায়তা দ্বারাই আমরা প্রকৃত বল লাভ করিতে পারি। এই যখন ব্যাপার, তখন তাঁহাদিগকে দুঃখের দশাটা বুঝাইয়া সেয়ানা করিয়া তুলিলে ক্ষতি কি? ইহাতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা নাই। ঘরের লক্ষ্মী কি কখনও পরের হইতে পারেন? ঘরে তাঁহাদের সেই লক্ষ্মীশ্রী সেই কল্যাণীশ্রী অম্লানই থাকিবে; কেবল বাহিরের অন্তরায় জ্ঞানে মনে মনে তুচ্ছ না করিয়া, প্রকৃত সহায় লাভে তাঁহাদিগকে উচ্চ জ্ঞান করিবার অবকাশ আমাদের হইবে। নতুবা দশ পাঁচটা জাঁকাল বিশেষণ জুড়িয়া গদ্যে পদ্যে নারীস্তোত্র গাহিলে, বিদেশীর চোখে ধুলা দিয়া উৎকট স্বদেশীয়ানাই দেখান হয়; বন্দিতাকে কিন্তু লজ্জিত করা হয়!

এই সব আয়োজনেও আমাদের কর্ম্মমন্দিরে সিদ্ধিদেবতার প্রতিষ্ঠা হইবে না। যতদিন মুসলমান হিন্দুকে রক্ষা না করিবে, যতদিন হিন্দু মুসলমানকে বরণ করিয়া না লইবে, ততদিন আমাদের উন্নতির আশা আকাশকুসুমবৎ থাকিবে। হে হিন্দু, তুমিই অগ্রসর হইয়া সেই ধর্ম্মপ্রাণ ঐক্যবলশালী যশস্বী তেজস্বী জাতিকে মহাযজ্ঞে আমন্ত্রণ করিয়া আন। দলে দলে তোমাদের সভাসমিতি মুসলমানভ্রাতাগণের দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাক্, তাঁহাদের পদধূলিতে ধন্য হইয়া উঠুক্। মায়ের সিংহাসন যদি উভয় দল বহন না করি, তবে দেশের মুখোজ্জ্বল হইবে না। মায়ের সিংহাসনচ্যুত ধান্যদূর্ব্বা উভয় সম্প্রদায়ের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুক্। এক মহাদুঃখের কৃষ্ণছায়াতলে দাঁড়াইয়া এ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, এ আত্মহত্যা আর কতদিন চলিবে? যেখানে কোরাণে বেদে দ্বন্দ্ব নাই, নমাজে পূজায় ভেদ নাই, সেই স্নেহমণ্ডপে জননী তাঁহার সকল সন্তানকেই আহ্বান করিতেছেন!

হে ইসলাম-পতাকাবাহী মহিম্ন জাতি, তোমরা যে আঁধারে ডুবিতেছিলে, তাহা তোমাদের অনেকের চোখে ধরা পড়িয়াছে। তোমাদের উদ্দেশে চিরোচ্চারিত সাবধান স্তোকবাক্য সেদিন সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের বাগাড়ম্বরে সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল! তা কি বিস্মৃত হইয়াছ? তোমাদের চৈতন্যলাভের সময় আসিয়াছে। ছিদ্রান্বেষীর বিদ্বেষবিষাক্ত ভেদবুদ্ধি ভুলিয়া আপন জননীর নিকট ঐক্যমন্ত্র গ্রহণ কর। মাতা তোমাদিগকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন। সেই সর্ব্বগ্লানিহরা মাতৃ-আশীর্ব্বাদে তোমাদের সকল শূন্য পূর্ণ হইয়া যাইবে!

তবে এস, হে সমবেত হিন্দুমুসলমান, তোমাদের সুপ্ত শক্তিকে আজ উদ্বুদ্ধ ও লুপ্ত সাধনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া এস। আজ বড় নিদারুণ দিন! তোমরা অনেক অবিচার-অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছ, কিন্তু এমন মর্ম্মস্থলে আর কখনও আহত হও নাই! ঐ যে প্রাসাদপ্রেরিত স্পর্দ্ধিত জয়ধ্বজা রাজাদেশ বহন করিয়া আমাদের কুটীরে কুটীরে পরাজয়কে ব্যঙ্গ করিয়া ফিরিতেছে, সেদিকে যেন আমরা দৃকপাতও না করি। আজিকার শোক যেন জলন্ত অশ্রুকে কঠিনীভূত করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত করে। একটা ধারাল কলমের খোঁচায় যেন আমরা ভাগ হইয়া না যাই! এই অস্বাভাবিক বিচ্ছেদে পুরুষানুক্রমিক বন্ধন যেন দৃঢ়তর ও প্রগাঢ়তর হয়। আহত হইয়াও যেন আমরা অব্যাহত থাকিতে পারি; নৈরাশ্যে যেন নির্ব্বাপিত হইয়া না যাই! যে ঔষধের গুণে চৌদ্দপুরুষ পরের জুতা ও গুঁতাকে অক্লেশে পরিপাক করিয়া আসিতেছি, এবার অদৃষ্টবাদের সেই হজমীগুলিটী ঝুলি ঝাড়িয়া বিদায় করিব! তবেই জননীর অমৃত-প্রলেপ আমাদের গভীর ক্ষতকে অচিরে জুড়িতে সক্ষম হইবে। তবে উত্থিত হও! জাগ্রত হও! সমস্ত দেশকে তোমরা এমন উত্তপ্ত করিয়া রাখ, যেন স্বেচ্ছাচারী রাজভৃত্যগণ তাহা হইতে কোন রস—কোন আরাম-

আড়ম্বর কি বিলাসের উপচার সংগ্রহ করিতে না পারে! মনে রাখিও, তোমাদের বড় সাধের বাঙ্গলা নির্ম্মমভাবে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে!—ভয় কি? ভাবনা কিসের! কত কবি তোমাদের আকাশকে উদ্দীপনায় পূর্ণ করিয়া রাখিবে; কত বক্তা তোমাদের বাতাসকে উত্তেজনায় মাতাইয়া রাখিবে; কত শিল্পী তোমাদের চক্ষে পুনরুত্থানের উন্মাদক চিত্র অঙ্কিত করিয়া ধরিবে! হে অধঃপতিত মহাজাতি, তোমরা বৃথা আপনাদিগকে অসহায়-নিরুপায় জ্ঞান করিও না। যাহার নিকট বাহুবল তুচ্ছ, সেই হৃদয়শক্তির উদ্বোধন কর। গৃহে গৃহে আজ অশৌচ ধারণ কর। শুধু মাসে কি বর্ষে তাহার অবসান নহে; এ শোকবহ্নি মহান্ মহরমের মত, বিধুর বিজয়াবৎ, পুরুষপরম্পরায় জ্বালাইয়া রাখ। পবিত্র জন্মভূমির নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও,—বিলাতী ত দূরের কথা, সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যকেই আমাদের সাদা-সিধা সংক্ষেপে-গুছান গৃহস্থালী হইতে যথাসাধ্য দূরে রাখিব। আমাদের কল্যাণীগণ আমাদের শুভসংকল্পে সহায় হইবেন; আমাদের ভবিষ্যতের আশা—শিশুগণকে এই বিদেশজাত প্রলোভন হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন। এ বেশভূষা, এ সারশোষক সৌখীন অনাবশ্যকতা স্বাধীনতাস্বাদতৃপ্ত ঐশ্বর্য্যমদদৃপ্ত জাতিরই শোভা পায়। আধিব্যাধিপীড়িত পরপদদলিত দারিদ্র্যদগ্ধ দাসগণের ললাটে উহা দুরপণেয় কলঙ্কচিহ্ন আঁকিয়া দেয়! আমাদের সন্ন্যাস, আমাদের ফকিরী আমাদের নফরীর মাথায় মুকুটের মত দীপ্তি পাইবে! গৃহ-ফকিরের দল সেই গরিবীকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ ও বরণ করিয়া লইব; উহাকে সেবা করিব; উহাকে সফল করিব।

এই যে রেলে-ষ্টীমারে সাহেবী ঢংএ সং সাজিয়া বাহির হই, সভা-সমিতিতে কি গোরার সম্মুখে সখ করিয়া ধড়াচূড়া আঁটিয়া হাজির হই; এই হাস্যাস্পদ দস্তুর কোথা হইতে আসিল? জাতীয় পরিচ্ছদকে, স্বদেশী

কায়দা-কানুনকে কাটিয়া ছাঁটিয়া আমরা স্বগর্ব্বে সর্ব্বত্র দাঁড় করাইয়া তুলিব। পেছনের চুল মড়াইয়া চামড়া বাহির করিয়া ছাড়া, ভদ্র গোঁফ-টাকে খামখা বাঁকাইয়া রোখা ও চোখা করিয়া তোলা, বাড়ীতে টেবিল পাতিয়া কাঁটাচামচের কসরত করা, এই সব ইঙ্গপনার খুঁটিনাটিকে হাসিয়া না উড়াইয়া, রাগিয়া তাড়াইতে হইবে। ইহাতে অজ্ঞাতে আমাদের জাতীয়তা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। অপরের উচ্ছিষ্ট না কুড়াইয়া আসল জিনিস বেমালুম আত্মসাৎ কর। পরের ধনকে ঘরের ছাপ দিয়া সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া লও; পরতন্ত্র হইতে মন্ত্র গ্রহণ কর, স্বাতন্ত্র্যকে বাহিরে জাহির করিতে ও ভিতরে বজায় রাখিতে। আমাদের জাতীয়সভা এই জাতীয়তা রক্ষার ভার লইবেন। আমাদের বড় গর্ব্বের, বড় গৌর-বের নিজের সাহিত্যকে জাতীয়তাগঠনযজ্ঞে পুরোহিতের পদে বরণ করিব। জন্মিয়া যে ভাষায় মা বলিয়াছি, মায়ের সেবায় সে ভাষাই লাগিবে। প্রাণের এমন পূর্ণপ্রকাশ কি আর কিছুতে হয়? ঘরের কারবারে ও বাহিরের দরবারে স্বগর্ব্বে সেই চিরপরিচিত সহজ সরল, গম্ভীর গম্ভীর, ওজস্বী উদ্দাম, মধুর মহিমাময় ভাষাকে সিংহাসন দিব। প্রতিদিনের কথায়, লেখায় ভাষা খাঁটি আপন হইবে। পরের ভাবটা শুধু নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিলেই হইবে না, ঘরের আদর্শে উহা শোধন করিয়া লইতে হইবে। এই ব্রত কঠোর তপস্যায় ও ঐকান্তিক নিষ্ঠায় প্রতিপালিত হইতেছে কি না, আমাদের নূতন সভাই তাহা দেখিবেন। নাগরিক সাহিত্য-পরিষদের ছাঁচে জেলায় জেলায় শাখা-পরিষৎ শুধু অসাময়িক নয়; অচলও বটে। রাশি রাশি প্রাচীন পুঁথির ধূলা ঝাড়িয়া জনকয়েক সাহি-ত্যিককে ডাকিয়া দেখান,—এ শ্রেণীর কর্ত্তব্যধারা রাজধানীতেই শুষ্ক হইয়া আসিতেছে; জেলায় মরিয়া যাইবে! এই উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নিকট একটি প্রার্থনা আছে।—তাঁর সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান

কাজ হৌক্, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম দখল। কৃত্রিম উপায়ে ঐ সব দেশ-বাসীকে সরকার একটী বরেণ্য ভাষার রসাস্বাদনে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। অবিলম্বে স্থায়ী ভাষাপ্রচারকের দল গঠন করিয়া ঐ সব দেশে বঙ্গভাষার নেশা ধরাইয়া দিতে হইবে। স্বভাবের প্রভাবে, ভাবের প্রবাহে বালির বাঁধ কোথায় ভাসিয়া যাইবে! আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তৃষিতেরা আর কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে না; আমাদেরই পথ তাকাইয়া আছে!

নবজীবনের প্রভাতেই ঘরে-বাহিরে বিপক্ষের চর ও অনুচর আমাদের পাছে লাগিয়াছে। ঘরের মূষিকদিগকে আমরা মার্জ্জনা করিব না! বাহিরে ষাঁড়ের সিং নাড়া আর চেঁচানী গ্রাহ্য করিব না,—হাতে না পারি, ভাতে মারিয়া চিরকাল ক্ষ্যাপাইব! যেই বণিকজাতির রুটীতে টান পড়িয়াছে, অমনিই এণ্ডু পেণ্ডু হইতে, যত সাদা চাম্ড়ার দল লাল হইয়া উঠিয়াছে! নিজের জিনিস নিজে ব্যবহার করিবে, নেটিভের এমনতর আস্পর্দ্ধা! এ কি কহা যায়, না সহা যায়!—হেয়ারষ্ট্রীটে ভারি চোখরাঙ্গানী ও ফোঁসফোঁসানী সুরু হইয়াছে! কোন স্বাধীন দেশের লোক এতবড় নির্লজ্জ ধৃষ্টতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইত। আমরা অবাক্ রহি, আর বাক্যুদ্ধ করি, মন বাঁধিব; পণ রাখিব। বিলাত কোট ছাড়িলে তবেই আমরা জোট ভাঙ্গিব। তখনও স্বদেশী ভাণ্ডারের দিকে আমাদের ঝোঁক কিছুতেই কমিবে না, শুধু বিলাতিবিদ্বেষের রোখ্ থামিবে; তখন অপরের জায়গায় বিলাতকে আগে চাহিব। যাহারা হুজুগ্ বলিয়া উড়াইতে চাহিয়াছিল, তাহারা বুঝুক্, আমাদের মুখে যেমন তোড়, বুকেও তেমনই জোর। বার্ণকোম্পানীর পরিত্যক্ত তিনশত মহাপ্রাণ যদি অনাহারে মরে, তবে বুঝিব, আমরা লাথি-গুঁতারই উপযুক্ত!

এই সঙ্কটে স্বদেশীকে সঙ্কল্পে অটল রাখিতে, স্বজাতিকে কর্ত্তব্যে সচল থাকিতে, তোমাদের একজন অখ্যাত অজ্ঞাত ভাষাসেবকের সদ্য-আশাগ-

স্ফীত হৃদয় আলোড়িত হইয়া বার বার আহ্বানধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইতেছে,—এস এস, হে সোণার বাঙ্গলার যমজসন্তান, সমবেত হিন্দুমুসলমান, মায়ের কাজে এস! ইহা উত্তেজনা নয়, উদ্দীপনা নয়; বিধাতৃপ্রেরিত সাবধানী তুরীধ্বনি! দীর্ঘযাত্রার আশ্বাসবাণী! মায়ের নিজের অভয়-ঘোষণা!

আর তোমরাও এস, হে বঙ্গের কুললক্ষ্মীগণ, আজ আমি তোমা-দিগকেই বিশেষভাবে কর্ম্মশালায় আহ্বান করিতেছি। আমরা তোমা-দিগকে ঘরে আটক্ রাখিয়াছি, তোমরা আমাদিগকে বাহিরে নির্ব্বাসিত করিয়াছ; এ বিচ্ছেদের তুলনায় বঙ্গব্যবচ্ছেদ অতি অকিঞ্চিৎকর। তাই আমি বিশেষভাবে তোমাদিগকেই আবাহন করিতেছি। এই দুর্দ্দিনে তোমাদের বেণী মুক্ত করিয়া দাও। সে বেণী আর বাঁধিও না। যতদিন বিচ্ছিন্ন বঙ্গ যুক্ত না হয় ততদিন উহাও অযুক্ত থাকুক্। বিদেশী বিলাস-প্রসাধনের সম্ভার সব স্বদেশ-দেবতার পদে নিবেদন কর। মায়ের স্বহস্তের স্নেহবয়ন—মোটা কাপড়েই তোমাদের লজ্জা নিবারণ হইবে; আমাদের মুখ রক্ষা হইবে। পরের নূন খাওয়াইয়া আর আমাদের গোলাম বানাইও না! পরের চিনির গোরারূপে যতখানি মিষ্টত্ব, তাহা পরীক্ষা করিতে বাকী নাই! পরের ঝুটা কাচকে চূর্ণ করিয়া নিজের কাঞ্চনকে করের ভূষণ করিয়া লও। আর কাজই বা কি কাঞ্চনে! সোণা হইতেও যাহা তোমাদের নিকট মহার্ঘ, এ দুঃসময়ে সেই দারিদ্র্যে পূত, শুভশুভ্র শঙ্খ শ্রীকরে নবশোভায় দীপ্যমান হইয়া উঠুক্। সেই শঙ্খপরিধানের ক্ষণে আমাদের কীর্ত্তিমন্দির হইতে সমুত্থিত ঘন ঘন মঙ্গল শঙ্খরব স্বদেশে বিদেশে জয়ঘোষণা করিয়া ফিরিবে। হে ব্রতচারিণী কল্যাণীগণ, পতিপুত্রের হিতার্থে তোমরা বহু ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছ; এবার বৃহত্তর ব্রত উদ্যা-পনের জন্য প্রস্তুত হও। তোমাদের পিতামহী-প্রপিতামহীরা জ্বলন্ত চিতায়

আরোহণ করিতেন; সেদিন গিয়াছে; এখন মহত্তর অগ্নিপরীক্ষায় তোমাদিগকে বৈদেহীর ন্যায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। কোটিকবিবন্দিত শতশিল্পীসেবিত কুসুমকোমলা সঙ্কোচবিহ্বলা মনোমোহিনীর মূর্ত্তি ছাড়িয়া তেজস্বিনী তপস্বিনীর বেশে আজ দগ্ধশ্মশানে আবির্ভূত হও। যে সতীত্বপ্রভায় সোণার সংসারকে পবিত্র রাখ, যে দৃঢ়তায় গৃহস্থালীর শৃঙ্খলাকে রক্ষা কর, যে তেজে অবাধ্য সন্তানকে শাসন কর; এস, সেই প্রতিভাদীপ্ত নারীত্ব লইয়া এস। তোমাদের মাতা-মাতামহীর সঞ্চিত মহিমা তোমাদের যে শক্তি দিয়াছে, তাহা আমাদের অক্ষয়কবচ হৌক্। নিজের হাতে সেই অভেদ্য বর্ম্ম পরাইয়া পতিপুত্রকে কর্ম্ম-অভিযানে—ধর্ম্মযুদ্ধে পাঠাইয়া দাও। তাহারা জয়ী হৌক্ বা পরাজয় লাভ করুক্, যখন গৃহে ফিরিবে, তখন তোমাদের বাতায়নসংলগ্ন নেত্র হইতে যেন তাহারা সেবার আভাস না পায়! তবে দূর কর আজ শীতল ব্যজন, ঢাল এবার ভৃঙ্গারের বারি, সরাও তোমাদের কোমল উপাধান! বাঙ্গালীকে তোমরা মানুষ করিয়া লও।

ছাত্রগণের প্রতি

(সঞ্চাবনী হইতে উদ্ধৃত)

নমস্কার, তোমাদের কার নমস্কার !
কে মানে বয়স, জাতি ?   ভাবী-গৌরবের ভাতি
পতিত দেশের যারা,—প্রণম্য আমার ।
ভবিষ্যের মহা আশা,   এ কবির ক্ষীণ ভাষা
শুধু তোমাদের চাহি লভিয়াছে বল,
যেমন সুনীল মেঘে   স্বর্গের আলোক লেগে
মুহূর্ত্তেই হয়ে উঠে অমল উজ্জ্বল ।—
আননে তারুণ্য মাখা,   ললাটে উৎসাহ আঁকা,
নয়নে জ্ঞানের জ্যোতি, হৃদয় উদার !
অবিচার নাহি জানো   ভেদাভেদ নাহি মানো,
আজ তাই অবমানে রুদ্র-অবতার !
এই ভালো, এই ভালো, আরো জ্বালো, আরো জ্বালো,
এ শিখা নিভে না যেন, ভাঙ্গে না এ পণ !
এ অগ্নি ইন্ধন পেয়ে   পড়ুক্ ভারত ছেয়ে,
আসুক্ মৃতের দেহে নূতন জীবন !

এক পতাকার তলে মিলিতেছ দলে দলে
এক মন এক পণ এক লক্ষ্য প্রাণে ;
মুছিয়া আঁখির নীর তুলিয়াছ নতশির,
জয় জয় মাতৃভূমি—উচ্ছ্বসিছে গানে।
তোমরা ঘুমালে আজ, কে করিত মা'র কাজ ?
কে মুছাত এ দুর্দ্দিনে মায়ের নয়ন ?
যে যেখানে আছ ব'সে, এস ক্ষোভে, এস রোষে,
বল দৃঢ়স্বরে,—ব্রত করিনু গ্রহণ !
ডাকি কহিছেন মাতা,— ভাই ছেড়ে থাকে ভ্রাতা ?
আয় একসাথে মিলে, নয়ন জুড়াক্ !—
কে সে কাপুরুষ দীন, মা'র ডাকে উদাসীন ?
যাক্, সে স্বদেশদ্রোহী দল ভেঙ্গে যাক্ !
নাই দ্বিধা, নাই ভয়, জয় জননীর জয় !—
উঠুক মিলিত কণ্ঠে আবার আবার।
মা'র সুসন্তানগণ, উচ্চার' সে দৃঢ় পণ !—
স্পর্শিবে বিদেশী পণ্য সাধ্য হেন কার !—
জননীরে দিয়ে লজ্জা বিদেশের শিল্পসজ্জা
তুলেছে উদ্ধত শির,—প্রাণে তা কি সয় ?—
হোক্ ছিন্ন জীর্ণ, ভাই, মা যা দেন, ভালো তাই,—
ব্যাপ্ত কর এই বাণী আজি দেশময় !—
দেখি' ভবিষ্যের ছবি আশায় আনন্দে কবি
তুলে নিল পরিত্যক্ত বীণাটী আবার,
সদ্য কৃতজ্ঞতাভরে আজি তোমাদের তরে
পাঠাল সে ছন্দে গাঁথি প্রীতি-উপহার।

মুলতান—একতালা।

প্রাণের মায়া এতই কি রে
বাঁচা যখন মরার প্রায়!
সোণার ভূমি, হা মা তুমি
লুটাইছ পাষাণ-ঘায়!
দেখি কেমন ওদের খাঁড়া
মোদের ও কোল করে ছাড়া,
সকল ছেলে পরাণ ঢেলে
রৈব বাঁধা চরণ-ছায়!